Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 561 - 573
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা আধুনিক গানের দুই স্রষ্টা : দিলীপকুমার রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম

ড. গৌরব চৌধুরী
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট
নজরুল সেন্টার ফর সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের (আসানসোল, ভারত)
Email ID :

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
বাংলা গান, সংগীত, দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, ‘দৈলিপী’ সংগীত, নজরুলগীতি, গীতিগুঞ্জ, সুরবিহার, সাঙ্গীতিকী, স্মৃতিচারণ, বুলবুল্।

Abstract

বাংলা গানের আঙিনায় বহু অচর্চিত প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে গবেষণার বিজয়রথ গতি পায়। আবার তথ্যাভাবে বা ইচ্ছার অভাবেও হয়ে পড়ে বিস্মৃত। হারিয়ে যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব, সৃষ্টির ঐতিহাসিক ক্ষণ। আজ ১২৫ বছর অতিক্রম করার পর পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায় এমন কিছু তথ্য যা আড়ালেই থেকে গেছে বা বিস্মৃত আবার কোনোটা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। কিন্তু সেই সমস্ত তথ্য থেকে উন্মোচিত হয় সেকালের কিছু শিল্পকর্মের পিছনের ইতিহাস আবার সাহিত্য-সৃষ্টির নথী। এমনই দুই সংগীত-মহারথীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সৃজন আধুনিক বাংলা সংগীতের মঞ্চ থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়েছে। তাঁরা হলেন, রবীন্দ্র-সমসাময়িক তথা রবীন্দ্রোত্তর এই দুইযুগের সফলতম ‘গীতকার’ — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুপুত্র ‘সুরসুধাকর’ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও শিল্প-সৃজন।

বাংলা গানের জগতে নজরুল সংগীতের বা নজরুলগীতির গবেষণার তবুও সন্ধান মেলে কিন্তু ‘দৈলিপী’ সংগীত বড়ই দুষ্প্রাপ্য। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই দু’জনের কাছেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গান, রেকর্ড সংগীত ঋণী। শুধু তাই নয় আমরা জানি বিংশ-শতকের বাংলা গানে মধ্যপ্রাচ্যের যে প্রধান দুটি সাংগীতিক রূপের নান্দনিক মিশ্রণ ঘটে তা হল— ঠুংরি ও গজল। এই দ্বিধারার প্রণয়ন করেন দুই সঙ্গীত-মহারথী। একজন রবীন্দ্র-সমসাময়িক গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন, যার সার্ধশতবর্ষ চার বছর আগে নীরবে পেরিয়ে গেছে এবং অন্যজন রবীন্দ্রোত্তর-ধারার সফল সংগীতবেত্তা কাজী নজরুল ইসলাম।

তবে, নতুনধারার প্রণয়ন তো শিল্পকলার বিকাশ নয়। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত রূপকার, আধার। যিনি সৃষ্টির বিকাশকে পৌঁছে দেবেন শ্রোতার মনের মাঝে। এই আধার ছিলেন দিলীপকুমার রায়, যাঁর ১২৫তম বছর নিয়মরক্ষার্থে লোকচক্ষুর প্রায় আড়ালেই পালিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়েছে। তিনিই সেই আধার ও রূপকার যিনি বাংলা গানের জগতে নজরুলের গানকে নিয়ে আসেন, স্বরলিপি প্রণয়ন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই বাগ্‌গেয়কারের প্রভায় বাংলা গান নব-সুরাভরণে সেজে উঠেছিল, যা প্রকৃত অর্থেই বিস্ময় জাগায়। তাই এই দু'জনের বিস্মৃত যোগসূত্র হয়ে উঠুক আলোচনার মূলকথা।

Discussion

বাংলা গানের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে বিস্ময়। সে কীর্তনের মতো 'মহান নাট্যসংগীত' হোক; বাউলের মতো দেহতত্ত্বের গান হোক; সারি, জারি, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া-র মতো পল্লীসংগীত হোক; রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তগীতি, অতুলপ্রসাদী বা নজরুলগীতির মতো জীবনদিশারী গানই হোক অথবা বিস্মরণের পথিক 'দৈলিপী' সংগীত বা দিলীপকুমার রায়ের গান হোক। যে সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হইনা কেন, পাই অনন্ত বৈচিত্র। সংগীত ও সাহিত্যের মেলবন্ধনে আমরা পেয়েছি বাংলা গানের নানান ধারা। এই প্রবাহ প্রচলিত হয়ে এসেছে সেই রামপ্রসাদ সেনের সময় থেকেই, কারণ এই সুর আজও মৌলিকত্ব বহন করে চলেছে, সময়ের পরিবর্তন যতই হোক-না কেন। বাংলা গানের সুরসৃষ্টির সীমানা শুধুমাত্র পল্লীসংগীতের বা ধ্রুপদ-ধামার-খেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমস্ত কিছুর সাথে সমতা বজায় রেখে আদিকাল থেকেই মৌলিক রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা গানের জগতে নজরুল সংগীতের বা নজরুলগীতির গবেষণার তবুও সন্ধান মেলে কিন্তু 'দৈলিপী' সংগীত বড়ই দুষ্প্রাপ্য। অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই দু'জনের কাছেই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গান, রেকর্ড সংগীত ঋণী। শুধু তাই নয় আমরা জানি বিংশ-শতকের বাংলা গানে মধ্যপ্রাচ্যের যে প্রধান দুটি সাংগীতিক রূপের নান্দনিক মিশ্রণ ঘটে তা হল— ঠুংরি ও গজল। এই দ্বিধারার প্রণয়ন করেন দুই সঙ্গীত-মহারথী। একজন রবীন্দ্র-সমসাময়িক গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন, যার সার্ধশতবর্ষ চার বছর আগে নীরবে পেরিয়ে গেছে এবং অন্যজন রবীন্দ্রোত্তর-ধারার সফল সংগীতবেত্তা কাজী নজরুল ইসলাম।

বাংলা গানের আঙিনায় বহু অচর্চিত প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে গবেষণার বিজয়রথ গতি পায়। আবার তথ্যাভাবে বা ইচ্ছার অভাবেও হয়ে পড়ে বিস্মৃত। হারিয়ে যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব, সৃষ্টির ঐতিহাসিক ক্ষণ। আজ একশো পঁচিশ বছর অতিক্রম করার পর পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায় এমন কিছু তথ্য যা আড়ালেই থেকে গেছে বা বিস্মৃত আবার কোনোটা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। কিন্তু সেই সমস্ত তথ্য থেকে উন্মোচিত হয় সেকালের কিছু শিল্পকর্মের পিছনের ইতিহাস আবার সাহিত্য-সৃষ্টির নথী। এমনই দুই সংগীত-মহারথীর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সৃজন আধুনিক বাংলা সংগীতের মঞ্চ থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়েছে। তাঁরা হলেন, রবীন্দ্র-সমসাময়িক তথা রবীন্দ্রোত্তর এই দুইযুগের সফলতম 'গীতকার'— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুপুত্র 'সুরসুধাকর' দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও শিল্প-সৃজন। একথা স্মর্তব্য যে, এই দুই গীতিকারের রচনার বিকাশ রবীন্দ্র-সমসাময়িক যুগে (১৯২০-২১) শুরু হয়ে রবীন্দ্রোত্তর যুগে (১৯৮০) শেষ। যদিও রবীন্দ্রোত্তর যুগ নজরুল সেভাবে দেখে যেতে পারেন নি, যেভাবে সাহিত্য বা সংগীত পিয়াসীরা প্রত্যাশা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরেই তাঁর চেতনায় নেমে এসেছিল বিস্মৃতির করাল ছায়া— এক দুরারোগ্য ব্যাধি। যে কারণে আপামর বাংলা তাঁর নবতর সৃষ্টির আস্বাদন থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, দিলীপকুমার ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। সংগীতে অগাধ পান্ডিত্য, বহুভাষাবিদ, দুর্লভ কন্ঠের অধিকারী, যে কোনো সপ্তকে স্বরপ্রক্ষেপণ ও স্বরান্তরে পারঙ্গম দিলীপকুমার রায়ের বিশেষ সাংগীতিক-রূপ আজ বাংলাসংগীত-জগৎ থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে। বহু স্থানে তাঁর পরিচয় সাধক হিসেবে অথচ বাঙালি ভুলে গেছে তাঁর অসাধারণ সাংগীতিক প্রতিভার কথা। কালের পরিহাস, উপযুক্ত উত্তরসূরীর অভাবে তাঁর গান আজও সংগীত জগতে বিস্মৃত। একদিন যার হাত ধরে বাঙালি চিনেছিল, ভালোবেসেছিল অতুলপ্রসাদের গান, রজনীকান্তের গান, কাজী নজরুল ইসলামের গান, রৈহান তায়াবজী-র কবিত্ব, নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর গীতিকবিতা, অখ্যাতনামা শান্তশীল দাসের ভক্তিগীতি,

রবীন্দ্র-স্নেহধন্যা সাহানা দেবীর গলায় 'দৈলিপী' গান, হিমাংশু দত্তর গান, পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের গীটার-বাদন, উমা বসু-র অসাধারণ সাঙ্গীতিক প্রতিভা যা রবীন্দ্রের স্নেহধন্য, 'ভারতরত্ন' শুভলক্ষ্মীর বাংলা গান ও হিন্দী ভজন, মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগাপাল মুখোপাধ্যায় ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের গান, বাংলা ভজন, 'মাথুর' ও 'মীরা' এই দুই চলচিত্র, ভারতীয়-পাশ্চাত্য সংগীতের তৎকালীন নব-মেলবন্ধন (যা বর্তমানে Fusion), এমনকি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের নানা ধারার নানা বৈচিত্রময় অরূপরতন। সেই মহান সংগীতকারের নাম বর্তমান সংগীতশাস্ত্রজ্ঞদের বেশিরভাগ পাঠ্য-পুস্তকের পৃষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত অথচ দিলীপকুমারই সংগীত-পাঠক্রমের জন্য দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যথাক্রমে 'সাঙ্গীতিকী' ও 'গীতশ্রী'। ভারতীয় সংগীতকে বিদেশে প্রচার করার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন দিলীপকুমার। লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস, প্রাগ, লুসানো— প্রতিটি শহরে তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিস্তৃত।

দিলীপকুমার বাংলার গীতিকবি, শিল্পীদের বিভিন্ন সময়ে সান্নিধ্য লাভ করেন। শুধু সান্নিধ্য পেয়ে তিনি ক্ষান্ত হননি। তাঁদের সম্পর্কে ও তাঁদের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে নিজ মতামত নানা রচনায় ব্যক্ত করেছেন। তার সেই সব রচনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংগীত-অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের কাছে অতুলনীয় সম্পদ। সেই রচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুল এই 'পঞ্চকবি' তো বটেই, এমনকি তাঁদের পরবর্তীকালীন বহু স্রষ্টার সম্পর্কে বহু লেখা পাওয়া যায়। সব থেকে বড় কথা এ লেখা শুধু স্তুতি নয় বা নিছক স্মৃতিকথা নয়। মানুষকে জানার বা তাঁদের সংগীতকে জানার কৌতুহল তাঁকে এই লেখায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৯২০-২১ সালে নজরুল ও দিলীপকুমার কলকাতায় আসেন। নজরুল প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর্ব শেষ করে সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হলেন অন্যদিকে দিলীপকুমার কেম্ব্রিজে 'ট্রাইপস্' ও ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-জার্মানী ঘুরে সেখানকার পাশ্চাত্য সংগীত, ভয়েস-ট্রেনিং শিখে সংগীতচর্চার মধ্যে দিয়ে 'ভ্রাম্যমাণ' হবার পরিকল্পনায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। সঠিক না জানা গেলেও দিলীপ-নজরুলের প্রথম সাক্ষাতের চিত্র বর্ণনা করেন তাঁদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার কমল দাশগুপ্ত। তখন ১৯২২-২৩ সাল। ভবানীপুরের 'রসা থিয়েটার'-এ (বর্তমানে 'পূর্ণ' সিনেমা, ৪ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড) এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কমল দাশগুপ্ত বলেছেন -

> "কাজী নজরুল ইসলাম সম্বর্দ্ধনায় এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীদিলীপ কুমার রায়। সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রায়। আমার বয়স তখন ১১/১২ বছর হতে পারে। কণ্ঠস্বর মেয়েদের মত। বড় ভাইয়ের কাছে (বিমল দাশগুপ্ত) শেখা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (খেয়াল), শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান গেয়ে বেড়াই। নাম হয়েছে মাষ্টার কমল। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের তখন আমরা স্বদেশীওয়ালা বলতাম। তাই দিলীপ কুমার রায় যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে নজরুল ইসলামের পরিচয় দিলেন তখন তাঁকে দেখে কবির বদলে স্বদেশীওয়ালা বলেই মনে হয়েছিল। সেই চেহারা আমি ভুলতে পারিনি বহুদিন।"[১]

একথা খুবই প্রাসঙ্গিক যে এই সময়ে নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য পরিচিত লাভ করেছেন এমনকি দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্যে নজরুলের গজল গানের প্রথম কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' নজরুল সম্পর্কে দিলীপকুমারের মন্তব্য চিস্মরণীয়, -

> "কাজীর গান! সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে - রামমোহন লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধুর পদার্পণ। তার পরেই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাওয়া -
>
> 'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল,
> এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।'
>
> রামমোহন লাইব্রেরীতে, ওভারটুন হলে ও য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আমি মাঝে মাঝেই 'চ্যারিটি কনসার্ট' দিতাম নানা অর্থার্থীর সাহাযার্থে। সে-বার ছিল বোধহয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে— ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু তো ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলেন— বিশেষ, যখন সে গাইল -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

‘ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা,
ও যে মুক্তিপথের অগ্রদুতের চরণ-বন্দনা!’

দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেই দেবতার রাজ্যরক্ষা হয়েছিল এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে? এই উপমা প্রেরণা আনে উপর থেকে যাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry-তে নাম দিয়েছেন শ্রুতি।”[২]

প্রকৃতপক্ষে ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও নজরুলের ত্রিবেণীসঙ্গমে বাংলা গানের জগতে ছড়িয়ে গিয়েছিল ঠুংরি ও গানের প্রভাব। শুরু হয়েছিল বাংলা গানে রবীন্দ্রোত্তর যুগের গানের-ধারা। বলা যায়, দিলীপকুমারের প্রথমবার দেশে প্রত্যাবর্তনের (১৯২০-২১) পর ১৯২৩ সাল থেকে বাংলা-ঠুংরি গানের প্রচার করেন। আবার ১৯২৬-২৭ সালে দ্বিতীয়বার বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে শুরু করে পণ্ডিচেরী আশ্রমে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের (১৯২৮) পূর্ব পর্যন্ত সময়ে নজরুলের বাংলা-গজল গানকে অর্জিত শিক্ষা দিয়ে সাজান।

১৯২২/২৩ সালে দিলীপকুমার সুরের ‘ভ্রাম্যমাণ’ হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গেলেন প্রবীণ, অভিজ্ঞ শিল্পীদের গান শোনবার জন্য, গান সংগ্রহ ও সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। যাত্রা শুরু হয়েছিল লক্ষ্মৌ দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল টপ্পা, ঠুংরি ও গজল শেখা। এই সূত্রে তিনি লক্ষ্মৌয়ের উস্তাদ আবদুল্ রশিদ্, অচ্ছনবাঈ, জানকীবাঈ, ইন্দরবাঈ, মঙ্গুবাঈ, হুশ্‌নাজান-এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। লক্ষ্মৌয়ে তিনি উঠতেন সংগীতবেত্তা ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর বাড়িতে মাসিক পত্রে প্রথম দেখলেন অতুলপ্রসাদের গান -

‘পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ্।
কেন রে, তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ?’

দিলীপকুমার এই গান শিখলেন সরাসরি অতুলপ্রসাদের কাছে। ক্রমেই এল বাংলা সংগীতের নবরূপায়ণের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শিখলেন আরও একটি গান। যে গান একসময়ে লক্ষ্মৌয়ের অবাঙালি শ্রোতাদেরও ভীষণ প্রিয় ছিল বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অতুলপ্রসাদের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনকালে হরিদ্বার থেকে ২১/১১/১৯৭১ তারিখে অরুণকুমার সেনকে দিলীপকুমার একটি অতিদীর্ঘ পত্র পাঠান। এই পত্র একদিকে যেমন অমূল্য তথ্যে ঠাসা তেমন মানুষ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ও অতুলপ্রসাদের গানের ব্যাখ্যার নির্ভরযোগ্য দস্তাবেজ। যদিও পত্র লেখার সময় দিলীপকুমার গানটি বিস্মৃত হয়েছিলেন। *‘স্মৃতিচারণ’* গ্রন্থে পাই -

“এরপরেই তিনি গাইলেন-

রুমক ঝুমক রুম ঝুম নুপূর বাজে...
বিরহী পরাণখানি সে দুটি চরণ যাচে।

ধূর্জটি সমঝদার তো— ব’লে উঠলো - ইউরেকা! এরই তো নাম সৃষ্টি!

আমি সায় দিয়ে সোৎসাহে বললাম: শুধু সৃষ্টি নয়, বাংলা গানে এর আগে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার আমদানি হয়েছে — কেবল ঠুংরি বাকি ছিল। আপনিই তার এ-অভাব পূর্ণ করলেন।”[৩]

শুরু হল ঠুংরি-আশ্রিত বাংলা গানের পথচলা। ক্রমশ অতুলপ্রসাদের গান দিলীপকুমার তাঁর নানা ‘কন্সার্টে’ নানান শিল্পীদের দিয়ে গাওয়াতে শুরু করেন। দেখতে দেখতে লোকপ্রিয় হতে থাকে সেসব গান। তখনকার সময়ে যারা এই গানের প্রশংসা করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছিলেন সোমনাথ মৈত্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, পাহাড়ী সান্যাল, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমিয়নাথ সান্যাল, রেণুকা মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। শুধু বাঙালি নয় বরং অবাঙালি শিল্পীরাও ছিলেন এ-গানের ভক্ত। কাশীর বিখ্যাত মোতিবাঈ পর্যন্ত ‘রুমক ঝুমক রুম ঝুম’ গানটি শেখেন দিলীপকুমারের কাছে। তাই অতুলপ্রসাদের গানের এই বিরাট কর্মযজ্ঞকে দিলীপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন -

“অতুলদার গান আমার কাছে ঠিক সময়েই এসেছিল, কেন না, সে-সময়ে আমি নানা ওস্তাদের ও বাইজির কাছে, বিশেষ ক’রে হিন্দি ঠুংরিতেই তালিম নিচ্ছিলাম। তাই বাংলায় ঠুংরির রস পরিবেশন ক’রে আমি নিখর্চায় নাম কিনলাম।”[৪]

যতখানি 'নিখর্চায়' নাম কিনেছিলেন বলে দিলীপকুমার প্রকাশ করুন না কেন, গানের পিছনে স্রষ্টার প্রভাব বজায় রেখে সেই গান ঠুংরি আঙ্গিকে পরিবেশন, শিক্ষণ, গানের বেদনাকে রূপদান ও সর্বোপরি স্বরলিপি তৈরি করা— এ-সবই ছিল যথেষ্ট দুরূহ কাজ। তবে শুধু ঠুংরি-চালের গানেই দিলীপকুমার মজে রইলেন না। ফিরে এলেন বাংলায়, ততদিনে বাংলা গানে শুরু হয়েছে আরেক শৈলীর মেলবন্ধন। সেই নবধারার বাংলা গানের জনক কাজী নজরুল ইসলাম। এখানে শুরু হল বাংলা গানে গজলের নবরূপায়ণ। এই গানের সূচনা-পর্বের দিকটির সাথে দিলীপকুমারের সান্নিধ্যের নৈকট্য সব চেয়ে বেশি। যে 'সুরবিহার' বা improvisation তাঁর চেতনায় বাসা বেঁধেছিল সে মুক্তি পেয়ে সুরলিপি লিখে দিল নজরুলের সে-যুগের গজল গানে। একথা মনে রাখতেই হয় যে তিনি বারে বারে আধুনিক সংগীতের মূলমন্ত্রটি এই 'সুরবিহার' দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বাংলা গানকে শাস্ত্রীয় সংগীতের সমতূল্য করে তুলতে। বাংলা গানে রবীন্দ্রোত্তর-ধারার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকলেও এঁরা দুজনেই উপলব্ধি করেছিলেন সংগীত মূলত একটি প্রবহমান ধারা। কিন্তু সে যুগের সংগীত-হাতে গোনা কিছুজন সমালোচকদের কাছে এই ভাবনা গ্রহণীয় হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়েছিল তীব্র বিরোধিতা। সেই বিরোধিতার কারণেই হয়তো নজরুল হয়ে গেলেন 'রবীন্দ্রবিরোধী' অন্যদিকে দিলীপকুমার পেলেন 'তার্কিক' উপাধি। যদিও 'দৈলিপী'-চিন্তায় সর্বাপেক্ষা সমর্থন ছিল নজরুল ইসলামের। দিলীপকুমার লেখেন -

> "সে গুণী ছিল তাই বুঝত যে মুক্তপক্ষ সুরকে স্বরলিপির কাঠামোতে বেঁধে রাখতে তার গগনবিহার ব্যাহত হয়ই হয়। আজ শুনি একদল অগায়ক ক্রিটিকের মুখে যে এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পরে এসব রুক্ষক্রিটিকদের মাথা-নাড়া উপেক্ষা করা চলে। কাজী আমার মুখে তার গানের নানা সুরবিহারে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল।"[৫]

এই বিষয়ে জানা যায় যে দিলীপকুমারের এই 'সুরবিহার'-এ নজরুলের গান নতুন গতি পেয়েছিল। স্বনামধন্যা সংগীত-শিল্পী ফিরোজা বেগম বলেছেন -

> "...তাঁর গজল গানগুলি কথায় ও সুরে তুলনাহীন কিন্তু গোড়ায় কিছুটা একঘেয়েমী ছিল। দিলীপকুমার রায়ের ভ্যারিয়েশনে সেই একঘেয়েমী কেটে গিয়ে এত সুন্দর হয়ে ওঠে যে মানুষের মনের গভীরে পৌঁছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ গানগুলিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে।"[৬]

গ্রাম-গ্রামান্তরে কতটা এই গানের প্রসার হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই নারায়ণ চৌধুরী-র লেখনী থেকে, -

> "কাজী সাহেবের গজল গান একদা বাঙলার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতো। উচ্চবিত্ত সমাজের সৌখিন গীতামোদী থেকে আরম্ভ করে খেটে খাওয়া বিড়ি মজদুর আর গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের মানুষের মুখে মুখে ওই সব গজল গানের কলি ফিরতো। দিলীপকুমারের সুরের ঢঙের সঙ্গে যদিও নজরুলের সুরের ঢঙের আকাশ পাতাল পার্থক্য, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুলের গজলের জনপ্রিয়তার পিছনে দিলীপকুমারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দিলীপকুমারই উদ্যোগী হয়ে গানের প্রচার সবচেয়ে বেশি করেছিলেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।"[৭]

এই ঘটনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরেক বিখ্যাত নজরুল সমসাময়িক গীতিকবি ও বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কবি প্রণব রায়ের কথায়। তিনি লিখেছেন -

> "কাজীদার বাংলা গজল গানের প্রথম প্রচার করেছিলেন যিনি, আজকে তিনি অন্য মার্গের একজন সাধক বলে পরিচিত। তখন তিনি সদ্য বিদেশ থেকে মিউজিক সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা, অনেক শিক্ষালাভও করে সবে দেশে ফিরেছেন। তিনি হলেন স্বর্গীয় ডি এল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার রায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম কাজী সাহেবের গান বিবিধ জলসায় গেয়ে গেয়ে প্রচার করে বেড়াতেন এবং দিলীপকুমারের বহু সুকণ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্রমশ গজল গাইতে শুরু করলেন। আমি নিজে এমনি বহু জলসা শুনেছি। সে জলসাগুলি হত রামমোহন লাইব্রেরী হলে।"[৮]

দিলীপকুমার তাঁর 'আলোর বাণীবহ নজরুল' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নজরুলের 'এত জল ও কাজল চোখে' গানটি থেকে 'জল বলে চল্ মোর সাথে চল্' গানটি রচনা করেন। দুটি গানই কাজরীর আদলে রচিত। তবে বর্তমান প্রচলিত

'আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন' গানের নৈকট্য অতুলপ্রসাদের গানের সাথে বেশি। নানান তথ্য দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় 'আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন' গানের সুর প্রামাণ্য সুর বা আদি-সুর নয়।

ইসলামী সংগীতে হাম্‌দ-নাত-সংগীত বিশেষ উল্লেখ্য। এটিও অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুর। যেহেতু অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌয়ের খাস-মানুষ তাই এই সুরও তাঁর অজানা হবার মতো নয়। তবুও আমরা নজরুলের 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গানটির সুর শুনি তবে খুব সহজভাবেই যে অতুলপ্রসাদী গানটি মনে আসে তা হল 'মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে'। এই গানটি অতুলপ্রসাদের কাছ থেকেই পাওয়া বলে ধরে নিতেই হয় কারণ নজরুলের গানটি ১৯৩৩ সালে মেগাফোন কোম্পানী JNG 57 রেকর্ডে আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মেদ-এর কণ্ঠে প্রকাশ করেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানটি তারও আগের রচনা কারণ আমরা জানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ *'গীতিগুঞ্জ'* ১৯৩১ সালে প্রকাশ করেন। নজরুলের 'আঁধার রাতে কে গো একেলা' গানটি 'আলেয়া' নাটকে 'কাকলি' চরিত্রের কণ্ঠে গীত। জানুয়ারী ১৯৩৪ সালে মেগাফোন কোম্পানী JNG 94 রেকর্ডে বাণী নিয়োগীর কণ্ঠে গানটি প্রকাশ করেন। এটি অতুলপ্রসাদের 'চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে' গানের জুড়িগান।

কাজী নজরুল ও দিলীপকুমার রায়ের সখ্যতা যে কতটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কারণ, হরি-হর আত্মার মিলন দেখা যায় না তা অনুভবে বোঝা যায় আর যা মনের গহীনে উপলব্ধ হয় তা কথায় প্রকাশিত হয় না বরং চেতনার স্তরে আবিষ্ট হয়েই থাকে। দৈলিপী স্মৃতিচারণে পাই, -

> "বলতাম ওকে— 'কাজী, তুমি কোনওদিনই বুড়ো হবে না; তোমার মাথার ঝাঁকড়া চুলে পাক ধরলেও মন তোমার চলবে যৌবনেরই ঘোড়শোয়ার হয়ে।' সে হেসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলত : 'তাই তো আমি আপনার ছোট ভাই বনতে পেরেছি দিলীপদা, হা হা হা।' এককথায়, সনাতন গতানুগতিকতার ও অকালবার্ধক্যের সে ছিল মূর্তিমান প্রতিবাদ। যখন হো হো করে ছাদফাটা হাসি হাসত তখন তার সে-উল্লাসের উলুধ্বনিতে গম্ভীরাননেরাও সাড়া না দিয়ে পারতেন না— সুকুমার রায়ের ভাষায়, কাজী কোনওদিনই নাম লেখায়নি 'রামগরুড়ের ছানা'দের দলে 'হাসতে যাদের মানা।'... উচ্চশিক্ষায় সে পোক্ত হয়ে ওঠেনি, তাই মামুলি দেঁতো হাসির সুশীল বিধিবিধানকে সে পাশ কাটিয়ে যেত তেমনই সহজে যেমন সহজে মোটর যান পাশ কাটিয়ে যায় গো-যানকে। সহজ সরল দিলখোলা এ মানুষটি দু'দিনেই আমার 'দৈলিপী' আসরের শুধু যে একজন প্রধান সভাসদ হয়ে উঠেছিল প্রায় মধ্যমণির কাছাকাছি।"[৯]

দিলীপকুমারের মতো মানুষের সংগীত-সভায় 'মধ্যমণির কাছাকাছি' থাকা সংগীত জগতের উচ্চপদ তথা উচ্চাসন। নজরুলের প্রতিভা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই তো নবসৃষ্টিকে সানন্দে গ্রহণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। সেই সব গানের মূলসুর গলায় তুলে আপন সংগীত-প্রভায় আলোকিত করেছিলেন। সুরাভরণের পরিবর্তে সুবিহারে সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছিল নজরুলের গান। তাই দিলীপকুমার বলেছেন -

> "এক সময় আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান, যথা, বাগিচায় বুলবুলি তুই, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, এত জল ও কাজল চোখে, কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি, চেও না আর চেও না সুনয়না এ-নয়ন পানে, কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম নাহি দিলে, কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে, সখী বলো বঁধুয়ারে নিরজনে, নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া পরান পিয়া, আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে প্রভৃতি।"[১০]

দিলীপকুমার রায় জন্মসূত্রে কাজী নজরুল ইসলামের থেকে মাত্র দুই বছরের বড় ছিলেন এমনকি সংগীত জগতেও গায়করূপে প্রতিষ্ঠা পান খুব অল্প বয়সেই। সে সময় নজরুল, গীতিকার রূপে উদীয়মান তরুণ। তবু সৃষ্টির জগতে এঁরা ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই কারণেই হোক বা সুর-জগতের দীপ্যমান নক্ষত্র হিসেবেই হোক তাঁদের সৃষ্টির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্বেই বলেছি দিলীপকুমার এই নজরুলের গজল গানের প্রথম প্রচারক ছিলেন। এই প্রচার শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সুদূর লক্ষ্ণৌয়ে অতুলপ্রসাদকেও শুনিয়েছিলেন। বাংলা গানে নতুন আঙ্গিক প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি খুবই আশাবাদী ছিলেন। যেহেতু লক্ষ্ণৌয়ে অতুলপ্রসাদ বাংলা ঠুংরী গানের রচনা করছিলেন তাই দিলীপকুমার যেন পথের দিশা পান। ঠিক সেভাবেই আশাবাদী হন নজরুলের গজল গানের প্রচারের বিষয়েও। দিলীপকুমার-কৃত দুটি গানের

স্বরলিপি আবিষ্কার করা গেছে যা দিলীপকুমার 'গীতিমঞ্জরী' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই স্বরলিপি ও স্বরলিপি-গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। দিলীপকুমার 'সুরবিহার' প্রসঙ্গে বারে বারে অকপটে স্বীকার করেছেন -

> "তার সঙ্গে আমার আর একটি মস্ত মিল ছিল এইখানে যে, তার গানে সুরবিহারের স্বাধীনতা আমাকে সানন্দেই দিত যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদে কাজী ও অতুলপ্রসাদ দুজনেই ছিলেন আমার দিকে। ... সে তার 'বুলবুল' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকেই উৎসর্গ করে। সে-যুগে আমার বাংলাগানের পাঁচটি ধারা ছিল : পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তের, কাজীর ও আমার নিজের। মনে পড়ে কত আসরে এ-দুই সুরকারকেই এক সঙ্গে শুনিয়েছি তাঁদেরই রচিত গান। এ-সৌভাগ্য কজন গায়কের হয়েছে জানি না। তবে যাঁদের হয়েছে তাঁদের কাছে এ-স্মৃতি থাকবেই অনুপমেয়— বিশেষ ক'রে এ জন্যে যে, অতুলপ্রসাদ ও কাজী শুধু গায়কই ছিলেন না, ছিলেন আদর্শ শ্রোতা তথা সমজদার।"[১১]

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর উৎসর্গ-বাণীটি ছিল -

"সুর-শিল্পী, বন্ধু
দিলীপ কুমার রায়
কর-কমলেষু
আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপ-রঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ!
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুলবুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি'।
আমার পাখির কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ ল'য়ে,
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হ'য়ে।...
তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুলবুলি,
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত্, তাহারে দস্তে লইও তুলি'!" [১২]

প্রতিভা বসুর লেখা থেকে জানা যায় দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্যে আসার পরে কীর্তনের প্রতি নজরুল খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লেখেন -

> "কীর্তনে পেয়ে বসলো ওঁকে পর পর তিনটে কীর্তন লিখলেন। শেখানো হয়ে গেলে বললেন, 'চলো কলকাতা চলো এবার। আমাদের কীর্তনের আসর বসাতে হবে নলিনীদার বাড়িতে। ঈশশ, মন্টু নেই, কী মজাই হত তবে।' ...দিলীপদা ততোদিনে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হয়ে চলে গেছেন। মনে আছে খবরটা পেয়ে খুব কেঁদেছিলাম। পন্ডিচেরী যাবার আগে ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন একটা। আমার মন খারাপের জবাবে ঠাট্টা করে লিখলেন, 'ভয় পেয়ো না, আমি তেমন সন্ন্যাসী নই যে তোমাদের ভুলে গায়ে ভস্ম মেখে চিমটে হাতে গিরিগুহার অন্তরালে বসে দিনযাপন করছি। এখানে খুব আনন্দ, খুব শান্তি, খুব আড্ডা। রাতদিন বসে বই পড়ি, বই লিখি, গান গাই। আসবে নাকি একবার?'"[১৩]

১৯২৮ সালে দিলীপকুমার রায়ের পন্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে চলে যাওয়া ও সন্ন্যাস গ্রহণ নজরুলের কতটা ব্যথা দিয়েছিল তা এই গানেই বোঝা যায় -

"সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি তরুণ বিবাগী
হের তব পায়ে কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া তব প্রেম মাগি' তরুণ বিবাগী।।"[১৪]

সে বেদনার সুর দিলীপকুমারের কাছেও অশ্রুত ছিল না। তাই লেখেন, -

> "বেদনা পেয়েছিল সে - কারণ আমি হঠাৎ সংসারের নীড় ও গানের আগুন ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে চলে যাই পন্ডিচেরী। তার আরো ব্যথা ছিল, আমি গানের প্রচার ছেড়ে দিলাম যোগের নীরবতা বরণ ক'রে অবশ্য নীরব আমি কোনো দিনই হইনি, (বরং আরও প্রকাশ-সমৃদ্ধিই লাভ করেছিলাম) কিন্তু সে ভয় পেয়েছিল ভেবে যে, আমি মৌনী হ'লাম বলে। তাই লিখেছিল দুঃখ ক'রে এসব কথা।"[১৫]

নজরুলের মননে দিলীপকুমার কেমন ছিলেন বহু রচনা তার সাক্ষী। দিলীপকুমারের সেইবারের বিদেশযাত্রার পূর্বে প্রায় দুইবছর আগে একটি স্তুতি রচনা করেন, যেটি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৩ তারিখে 'সুরকুমার' শিরোনামে *'ফণিমনসা'*-য় প্রকাশিত হয়েছিল।

> "বন্ধু তোমার স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
> সপ্ত সাগর তেরো নদীর পার হতে সুর-নন্দিনী!
> বীণ-বাদিনী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি;
> অরুণ আঁখি কইল সাকি, 'আজকে শরাব মুলতুবি!'
> সাগর তোমার শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
> গানের ভেলায় চললে ভেসে রূপকথারই রাজকুমার!
> যক্ষ-লোকে রূপার মায়ার রূপ যথা আজ সুপ্ত, হায়!
> লয়ে সুরের সোনার কাঠি দিগ্বিজয়ে যাও সেথায়।
> বন্দি-দেশের আনন্দবীর! আনবে তুমি জয় করি
> ইন্দ্রলোকের উর্বশী নয় কণ্ঠলোকের কিন্নরী।"[১৬]

আবার সেই সূত্রেই মনে পড়ে বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে এই নজরুল কী বিপুল বন্ধুপ্রীতি থেকে রচনা করেন 'সুরের দুলাল' (কল্লোল, মাঘ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), -

> "পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন-শেষে,
> সুরের দুলাল, আসলে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বরবেশে!
> আজও মালা হয়নি গাঁথা হয়নি আজও গান-রচন,
> কুহেলিকার পর্দা-ঢাকা আজও ফুলের সিংহাসন।
> অলস বেলায় হেলাফেলায় ঝিমায় রূপের রংমহল,
> হয়নিকো সাজ রাজকুমারীর, নিদ ছুটেছে এই কেবল।
> আয়োজনের অনেক বাকি - শুননু হঠাৎ খোশখবর,
> ওরে অলস, রাখ আয়োজন, সুর-শাজাদা আসল ঘর।..."[১৭]

দিলীপ-সখা নজরুল যে শুধু দিলীপকুমারের বন্দনাগীতি গেয়েছিলেন তা নয়। ১৯২৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরে কলকাতা ইউনিভার্সিটি হলে প্রমথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫২তম জন্মদিবস পালিত হয়। নজরুলকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় সেই সভায়।

> "এই অনুষ্ঠানের জন্য দিলীপকুমার রায় নজরুলকে দিয়ে প্রায় ঘরে বন্ধ করে একটি গান লিখিয়ে নিয়েছিলেন। গানটি সভায় স্বয়ং দিলীপকুমার রায়ই গেয়েছিলেন, যথারীতি নজরুলের সুরে নিজের যোজনাসহ। সম্ভবত গজলের প্রেরণা ছিল সুরবিহারে।"[১৮]

গানটি ছিল, -

> "কোন্ শরতের পূর্ণিমা চাঁদ কে মথিল তব তরে আনিলে এ ধরাতল?
> দুয়ার ভাঙা জাগল জোয়ার কোন সে ব্যথার সিন্ধু জল।।
> আজ ভারতী অশ্রুমতী উঠল জেগে রূপকুমারী
> আকাশে চকোরী কাঁদে বেদনার এই দরিয়ায় মধ্যে দুলে টলমল।।"[১৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গানটির সুর পাওয়া যায় না, আর এ-প্রসঙ্গে নজরুল-জীবনীকার অরুণকুমার বসু মনে করেন যে এই গানটি নিছক 'ফরমায়েশি' এবং দিলীপকুমারের স্বপ্রতিভাজাত আঙ্গিকেই গীত। ১৯২৮ সালে সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকা ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই কবি মৌলানা মোয়ায়েদ বখত চৌধুরী পত্রিকার সম্পাদকের কাছে প্রস্তাব দেন, -

> "নজরুল ইসলামের প্রতিভা যথার্থই যুগপ্রবর্তক। তাঁকে তরুণ বাংলার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হোক ও অভিনন্দনপত্র দেওয়া হোক।"[২০]

কিন্তু, নজরুলের রাজনৈতিক বিপ্লববাদী ভূমিকা এবং সামাজিক অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা, বিশেষত ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর সরব নির্ভীক সমালোচনা, মৌলবাদী মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করেছিল। এমনকি নজরুল-বিরোধিতার একটি ধ্বংসাত্মক গোষ্ঠী গড়ে তুলছিল। সে সময়ে নজরুলকে বাংলার নানা প্রান্ত থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, অভূতপূর্ব সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে দেখে কলকাতাতেও একটা বড় সংবর্ধনাসভার পরিকল্পনা করার কথা ভাব হল। স্বাভাবিকভাবেই নজরুলের নামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দুটি শিবির গড়ে উঠল। প্রস্তাবিত সংবর্ধনায় একটি বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্যের জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা। ৯ অক্টোবর ১৯২৮-এ মুসলিম ইনস্টিটিউট হল-এ জনসভা ডাকা হল যার আহ্বায়ক হিসেবে 'সওগাত' কিছুজনের সম্মতি ও স্বাক্ষর গ্রহণ করলেন। যাঁদের সম্মতি ও স্বাক্ষর নেওয়া হল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বয়ং দিলীপকুমার রায়। শুধু তাই নয়, এই জনসভায় দিলীপকুমার অন্যতম সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করলেন। কারণ দিলীপকুমারের ভাবনায় নজরুলের 'বিদ্রোহী'-রূপের এক যৌক্তিকতা ছিল। এটি নজরুলের চেতনার মূলমন্ত্র, তাঁর জীবনের আরাধ্য— 'প্রলয়সুন্দর বন্ধু'। তাই দিলীপকুমার নজরুলের এই বিদ্রোহী-ভাবকে কুর্ণিশ জানিয়ে লিখেছিলেন, -

> "বিদ্রোহী হওয়া এ-সংসারে সহজ নয়। মানুষ পারৎপক্ষে কাউকে বলেতে চায় না যে, সে অনায় করেছে। কিন্তু কাজী ছিল স্বভাব-বিদ্রোহী— born rebel; মেলামেশায় দহরম মহরমে তার জুড়ি ছিল না বটে কি ঐ সঙ্গে অসামাজিক কথা বলতেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না কেউ, এক মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া। অত্যাচার, কপটতা, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, গোঁড়ামি এ সবের প্রতি এঁরা দু'জনেই ছিলেন খড়্গহস্ত।... আমরা সবাই অভিভূত হয়ে পড়তাম তার এই আশ্চর্য প্রকাশভঙ্গীতে: এ-ধরণের চরণ কি স্বভাব-প্রতিভাধর ছাড়া কারুর কলমে এমন স্বত-উৎসারে বইতে পারে? কাজী বিদ্রোহী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। তাই বুঝি তা বিদ্রোহে মানুষের মনে ছোঁয়াচ লাগত এত ব্যাপক-ভাবে। কত সভায় এবং চ্যারিটি কনসার্টেই না সে আমাদের গানের পরে এই-ভাবের নানা গান গাইত ঝাঁকড়া দুলিয়ে ভাঙা গলায়, কিন্তু এমন গাইত যে, ভাঙা গলাকেও ভাঙা মনে হত না আগুন ছুটিয়ে দিত সে। এমন প্রাণোন্মাদী গায়ক কি আর দেখব এ-মনমরা যুগে? সত্যিই আমাদের অবাক লাগে ভাবতে ভাঙা গলায়ও কাজী কোন্ যাদুতে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করত দিনের পর দিন — ভাবের ঢলে পাথরের বুকে আলোর ঝর্না বইয়ে!"[২১]

কিন্তু বর্তমানে নজরুলের গানে অন্য গীতিকারদের অনুপ্রবেশ অনেক গীতি-গ্রন্থ ও সংকলন গ্রন্থের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। হয়তো নজরুলের জীবৎকালে যথার্থ সংগ্রাহক ও সংরক্ষকের অভাবেই সমস্ত গানগুলিকে সঠিকভাবে একত্রিত সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। আবার অন্য কোনো বিদগ্ধ নজরুল গবেষকদের কিছু ভাবনায় অসংগতি থাকার কারণেই অন্য গীতিকারদের গান সংকলিত হয়েছে নজরুল সংগীত রূপে অথবা কবিতায়। এমনকি নজরুল-গানের ভাণ্ডারী, সংরক্ষক ও বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর বলেন -

> "নজরুলগীতির জগতে অন্য গীতিকারের গানের অনুপ্রবেশ বর্তমানে একটি প্রধান সমস্যা। ১৯৬০ সালের পর নতুন করে নজরুল চর্চা শুরু হলে এই অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। নজরুল সহচরগণ এবং ঘনিষ্ঠজন এই কাজের পথিকৃৎ।... আবার যাঁরা এই ধরণের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন, তাঁরাও একই ভুল করেছেন।"[২২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 67
Website: https://tirj.org.in, Page No. 561 - 573
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু যখন স্বয়ং ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সংকলিত ও সম্পাদিত 'অগ্রন্থিত নজরুল' (ডি. এম. লাইব্রেরী প্রকাশনা) গ্রন্থের 'ভূমিকা' দেখি তখন বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। তিনি এই সংকলনে সেই সমস্ত রচনাকে নজরুলের বলে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি নজরুলের নামাঙ্কিত ছিল না, রেকর্ড বুলেটিনে প্রকাশিত এবং অন্যত্র সন্ধান করে পেয়েছেন। কবিতার ক্ষেত্রে বলেছেন, -

> "ক. 'আত্মকথা;', 'মন বুঝানো', বক্তুৎসব'— কবিতাগুলি ধূমকেতু পত্রিকায় রচয়িতার নাম ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষা, ভাব ইত্যাদির নিরিখে এগুলিকে নজরুলের হিসাবে গ্রহণ করেছি।
>
> ঙ. 'তরুণের বিদ্রোহ', 'নপুংসকের ন্যাকামি' ও একটি শিরোনাম হীন প্রবন্ধ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে নজরুলের বলে গ্রহণ করেছি। 'আগডুম বাগডুম', 'মুসলিম জাহান', 'পরদেশী পঞ্জী' ইত্যাদি সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য।
>
> কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা ও গানের উদ্ধার কার্যে সহায়তার জন্য ইন্দিরা বিশ্বাস ও আদিত্য সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"[২৩]

ভাব, ভাষার প্রয়োগ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে কোনো নির্দিষ্ট রচনা কোন রচয়িতার, তা এতখানি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে? সাহিত্যের জগতে সাহিত্যিক কে, এই অনুসন্ধানে এতটা সুস্পষ্ট নির্দেশ কি করে সম্ভব? যদি কবির স্বরচিত অনুমোদন বা সমর্থন না থাকে, তবে রচনা উক্ত কবির বলা যায় না এমনকি গ্রহণীয়তাও থাকে না। তার উপর 'আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য' সাক্ষ্য কে দিয়েছেন তা জানার উপায় নেই। সে সাক্ষ্যের সত্যতা বা যৌক্তিকতার সূত্রটিও সম্ভবত বিলুপ্ত। উল্লিখিত গ্রন্থের '৩২নং ও ৩৪নং থেকে ৩৭নং গানগুলি'র অশুদ্ধ পাঠের পরিবর্তে শুদ্ধ পাঠের উল্লেখ করেছেন অথচ ৩৯ নম্বর গানের সম্পর্কে সঠিক তথ্যের উপস্থাপনা করে উঠতে পারেননি। এই গানটি হল 'আর কিছু তো জানি না মা'। গানের তথ্যসূত্রে আছে 'ঐ' অর্থাৎ পূর্বোক্ত গানের অনুরূপ। অর্থাৎ - ১) পাণ্ডুলিপি, ২) বুলেটিন, এইচ. এম ভি, জানুয়ারি, ১৯৪১।[২৪]

পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করি প্রবন্ধ রচয়িতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে উক্ত রেকর্ডটি সচল অবস্থায় আছে। ১০ইঞ্চি ৭৮পাকের গ্রামোফোন রেকর্ডে যে তথ্য লিপিবদ্ধ আছে তা প্রথমে ব্যক্ত করি, -

আর কিছু তো জানিনে মা
"His Master's Voice" [HMV], Bengali Song, Devotional
N. 27076, **(কথা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য)**
Harendra Nath Chatterjee **শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়**
[Matrix Number] OMC. 13091

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালে এই রেকর্ড কোম্পানি থেকেই ১০ইঞ্চির ৭৮পাকের রেকর্ডে 'সুরসুধাকর' দিলীপকুমার রায়ের দুটি গান প্রকাশিত হয়। দুটি গানের ভিন্ন শিরোনামে গানগুলি প্রকাশ পায়, যথা 'শরণাগত' ও 'সফল'। এর মধ্যে 'শরণাগত' গানের পরিচয়ে পাওয়া যায় -

শরণাগত
"His Master's Voice" [HMV], Bengali Devotional
N. 17399, **কথা : শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য**
D. K. Roy, **দিলীপ কুমার রায়**
[Matrix Number] OMC. 12584
[রেকর্ডে-ধৃত গানের গীত-রূপের প্রথম পংক্তি 'আর কিছু তো জানিনে মা']

এখন প্রশ্ন একই রেকর্ড কোম্পানীতে প্রকাশিত N. 17399 নম্বরের রেকর্ডের তথ্য N. 27076 নম্বরের রেকর্ডে কিভাবে বদলে যেতে পারে? আবার দুটি গান শুনলেই বোঝা যায় 'দৈলিপী' আঙ্গিকে সৃষ্ট, তফাৎ শুধু কীর্তনের গায়কী ও আখরের প্রয়োগে। এই রেকর্ডে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দেখা গেছে ৩ মিনিট ২৬ সেকেন্ডের গানের মধ্যে প্রায় ১ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ রেকর্ডের প্রায় ৪৬% সময় ধরে কীর্তনের 'কথার তান' ব্যবহার করা হয়েছে। সবদিক থেকে বিচার করলে এখানে একটিই মাত্র সিদ্ধান্ত থেকে যায় যে, তথ্য বিভ্রান্তি ঘটেছে। গ্রন্থের মুদ্রিত পাঠের সাথে দুটি রেকর্ডেরই পাঠের ভিন্নতা রয়েছে একথা তো বলাই বাহুল্য। আবার 'পাণ্ডুলিপি' সম্পর্কে সঠিক সন্ধান তিনি দেননি, ফলে এই তথ্যও অনিশ্চিত। অর্থাৎ তথ্যবিভ্রান্তির ফলে দিলীপকুমার রায়ের গান হয়ে গেছে নজরুল সংগীত।

আরেকটি গান সম্পর্কে না বললেই নয়। কারণ এই গানেও দিলীপকুমার ও নজরুল সংকলন কর্তাদের বিভ্রান্তির কারণে জড়িয়ে। ১৯২০/২১ সালে দিলীপকুমার লণ্ডন-প্রবাস-কালে 'থেকো প্রিয় পাশে' জগদ্বিখ্যাত গায়িকা Dame Clara Ellen Butt (১৮৭২-১৯৩৬)-এর কণ্ঠে শোনেন। মূলগানটি বর্তমানে বহুশ্রুত –

Abide with me, fast falls the eventide:
The darkness deepens, Lord, with me abide!
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, oh, abide with me.

থেকো প্রিয় পাশে... সাঁঝপাখা আসে নেমে:
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে।
যবে ছেড়ে যায় সবে— সুখ নাহি হাসে
অনাথের নাথ, তুমি থেকো মোর পাশে।[২৫]

এই গান তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলো Titanic-এর সলিলসমাধির কথা, যেখানে অসংখ্য নরনারী সেই পরম ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের সর্বময়তাকে অন্তিম লগ্নে প্রার্থনা করছেন। অবশ্য এখানে যে বিষয়টির উল্লেখ আবশ্যক তা হল, এই গানটি ইতিমধ্যে, হরফ প্রকাশনীর *'নজরুলগীতি (অখন্ড)'*-এর ৩৯৪ পৃষ্ঠায় '১৫০৬' সংখ্যক 'ভক্তি-গীতি' বিষয়ক গান হিসেবে প্রকাশিত। শ্রীমতী কল্যাণী কাজী সম্পাদিত *'কাজী নজরুলের গান'* (সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশন্‌স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা) গ্রন্থের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় '১৯৪৪' সংখ্যক গান, এছাড়াও কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত *'নজরুলগীতি সহায়িকা'* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থের ২৫৩ পৃষ্ঠায় '১৫৪৪' সংখ্যক গান হিসেবে বলা হয়েছে, 'প্রকাশ : গীতিমাল্য নজরুলগীতি তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, অখন্ড নজরুলগীতি, হরফ (গীতিমাল্য) বিষয় : ভক্তিমূলক'। আবার ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত *'নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা'* (কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় '১৩৩৮' সংখ্যক গান হিসেবে বলা হয়েছে, 'থেকো প্রিয় পাশে গ্রন্থ : ১. গীতিমাল্য ২. নজরুলগীতি - অখন্ড, হরফ ৩. নজরুল রচনাবলী, ৩য় খন্ড, ঢাকা।' অর্থাৎ গবেষণা করতে গিয়ে আমি দেখতে পাই, দিলীপকুমার রায়ের এই গানটি নজরুলের গান হিসেবে সংকলন-কর্তারা দেখিয়েছেন। কোন্ সূত্র ধরে তা এ কাজ করলেন আমার জানা নেই। যদি *'গীতিমাল্য'*-কেও প্রামাণ্য ধরি তবে প্রকাশ সালগুলি খেয়াল রাখার প্রয়োজন। দিলীপকুমার রায়ের 'থেকো প্রিয় পাশে' গানটি ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে হিজ মাস্টার্স ভয়েজ রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়। রেকর্ড নম্বর N 17440 যেখানে একদিকে ছিল পূর্বোক্ত গানটি অন্যদিকে 'শ্যামল! চিরজীবন ঘিরি' [এই গানটির কথা সাহানা দেবীর] এবং সুরকার দিলীপকুমার রায় স্বয়ং। এই গানের মুদ্রিতরূপ প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় দিলীপকুমারের *'সাঙ্গীতিকী'* গ্রন্থটিতে। অন্যদিকে *'গীতিমাল্য'* (গান), কলকাতার 'কথাভারতী' থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ বা আনুমানিক ১৯৬৯ সালে। অর্থাৎ গানের গীতরূপ বা রেকর্ড প্রকাশিত হবার উনত্রিশ বছর পরে আর গ্রন্থাকারে মুদ্রিত আকারে প্রকাশের

একত্রিশ বছর পরে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন কবির বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই গ্রন্থের সংকলিত গানগুলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন -

> "কবির দুই ছেলে— কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ, তখন ছিল কলেজের ছাত্র। কোথায় কি আছে তাঁদের জানবার কথা নয়। তবু তারা এখান-ওখান থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছে কিছু অপ্রকাশিত গান। কবির স্নেহধন্য সুরশিল্পী ভাতৃদ্বয়— শ্রীসারদা গুপ্ত ও শ্রীবরদা গুপ্ত নানাভাবে সাহায্য করেছে এবং কবির অনুরাগী ভক্ত শ্রীমান সমীর ঘোষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু গান অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছে।
> সেই সব সংগ্রহ করা গানের সংকলন এই 'গীতিমাল্য'।"[২৬]

সুতরাং এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় সংকলনের সময় এটি নজরুলের গান বলে মুদ্রিত হয়েছে এবং এই ভ্রান্তির পুনঃপ্রকাশ হয়েই চলেছে। যদি সুর সম্পর্কে সংকলকগণ খেয়াল রাখতেন তবে প্রকাশিত সুরটি সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু মন্তব্য করতেন। কিন্তু কোথাও এমন কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না কারণ শ্রীমতী কল্যাণী কাজী তাঁর 'কাজী নজরুলের গান' (সাহিত্য ভারতী পাব্‌লিকেশন্‌স প্রাঃ লিঃ) গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক সূচীতে 'খন্ড-সংখ্যা / স্বরলিপি-গ্রন্থ' হিসেবে যে তালিকা দিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৫৫৩ / গীতসংখ্যা ১৯৪৪) এই গানের পাশে কোনো সূত্র নির্দেশিত হয়নি। তাই এটি নজরুলগীতি নয়, দিলীপকুমার রায়ের গান।

পরিশেষে বলতেই হয় ঈশ্বর এই দুই-মেরুর, দুই সংগীত মহারথীদের এনেছিলেন বাংলা গানের তথা বঙ্গ-সাহিত্যের আঙিনায়। তাঁদের মিলনে বঙ্গীয়-গীতিসাহিত্য যে ঐশ্বর্য লাভ করেছিল, সেখানে ছড়িয়ে আছে অমূল্য মণিমাণিক্য। বাংলা গানের ধারা রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রবাহিত হয়েছিল নতুন দিগন্তের উন্মেষণে। ভারতীয় সংগীতের পাশাপাশি বাংলা গানে মিশেছিল পাশ্চাত্য, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা ধারা। যে কারণে গান হয়ে উঠেছিল জীবনের আরাধ্য ও স্বতন্ত্রে উজ্জ্বল। যেন এঁরা একাই এককেটি প্রতিষ্ঠান। কাজী নজরুলের স্রষ্টারূপী জীবন পূর্ণতার অনেক পূর্বেই নিস্তব্ধ হলেও সদা দীপ্যমান আপামর বাঙালির কাছে। অন্যদিকে দিলীপকুমারের জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর হৃদয়ে কাজী নজরুল চিরভাস্বর ছিলেন। তাই তো নজরুল-স্মৃতিতে বলেছেন -

> "কাজীকে চিরদিনই আমি স্নেহ ক'রে এসেছি অনুজের মতন। সেও আমাকে বরাবর অগ্রজের মতনই মান দিত, ভালোবাসত। অতি সরল প্রশ্নহীন একমুখী ছিল সে ভালোবাসা। তার স্বভাবের গতিই যে ছিল একমুখী সরল।"[২৭]

Reference:

১. সেনগুপ্ত, কল্পতরু (সম্পাঃ), *নজরুল গীতি অন্বেষা,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, বসুমতী সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৫, পৃ. ৪০

২. রায়, দিলীপকুমার - 'কাজী নজরুল ইসলাম', *নজরুল স্মৃতি,* দে, বিশ্বনাথ (সম্পাঃ), কলকাতা, সাহিত্যম্‌, পৃ. ১৯-২০

৩. রায়, দিলীপকুমার, *স্মৃতিচারণ,* প্রথম সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ৭ই আশ্বিন ১৮৮২ [শক], পৃ. ৫২০

৪. তদেব, পৃ. ৫২২

৫. *নজরুল স্মৃতি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৬. *নজরুল গীতি অন্বেষা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৭. তদেব, পৃ. ১৪৩

৮. রায়, প্রণব - 'কাজী সাহেবের গান: সঙ্গ-প্রসঙ্গ', *দেশ,* কলকাতা, বিনোদন সংখ্যা ১৩৯১, পৃ. ৬৭

৯. রায়, দিলীপকুমার, *এদেশে ওদেশে, দিলীপকুমার রায় রচনাসংগ্রহ - ৬,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ২০০৯, পৃ. ১৪৪

১০. *নজরুল স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

১১. তদেব, পৃ. ১৯

১২. ইস্‌লাম, নজরুল্, *বুল্‌বুল্ (প্রথম ভাগ)*, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, নতুন সংস্করণ (ডি. এম.), আষাঢ় ১৪০৯, [উৎসর্গ-পত্র]

১৩. বসু, প্রতিভা, *জীবনের জলছবি*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১, পৃ. ৪৯-৫০

১৪. কাজী, কল্যাণী (সম্পাঃ), *কাজী নজরুলের গান*, কলকাতা, সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশন্ প্রাঃ লিঃ, ২০১২, পৃ. ৫২৯

১৫. *নজরুল স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

১৬. *নজরুল রচনাবলী : তৃতীয় খন্ড*, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৬৮

১৭. *কল্লোল* (মাঘ ১৩৩৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ২৮৭

১৮. বসু, অরুণকুমার, *নজরুল জীবনী*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬, পৃ. ৩৯২-৯৩

১৯. তদেব, পৃ. ৩৯২

২০. তদেব, পৃ. ৪১২

২১. *নজরুল স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

২২. ঠাকুর, ব্রহ্মমোহন (সম্পাঃ), নজরুল-গীতি (অখণ্ড), ভূমিকা, তৃতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ১৪-১৫

২৩. ঠাকুর, ব্রহ্মমোহন (সং ও সম্পাঃ), *অগ্রন্থিত নজরুল*, ভূমিকা, কলকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, পৃ. (৩)

২৪. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭

২৫. রায়, দিলীপকুমার, *সাঙ্গীতিকী (সুর ও কথার কলহ), দিলীপকুমার রায় রচনাসংগ্রহ [১]*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ৩১

২৬. ইসলাম, কাজী নজরুল, *গীতিমাল্য*, ভূমিকা – শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক – শ্রীমদনগোপাল মিত্র, কলকাতা, কথা-ভারতী, ১৯৬৯

২৭. নজরুল স্মৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭